নাটকে কাব্যময়তাই গুত্বপূর্ণ

শেখর সমাদ্দার

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা নাটকের কথা যদি বলতে চাই তাহলে একটা সমস্যা হবে সময়টা নির্বাচন করব কী ভাবে। রবীন্দ্রনাথের নাটকের বয়স সময়ের দিক থেকে ভাবলে ১৯৩৯ পর্যন্তই ধরা যায়। এটা এখন স্পষ্ট যে মুক্তধারা, রক্তকরবী, কালের যাত্রা - যে তিনটি নাটক রবীন্দ্রনাথ ছিলেছিলেন ১৯২৪ সালের মধ্যে তারপর আর যে নাটকগুলো লেখা হয় সেগুলো আমরা যাকে বিশুদ্ধ অর্থে নাটক বলি, ইউরোপীয় অর্থে নাটক বলি - সে রকম নয়। সেগুলো নাটকের একটা পরীক্ষা বলা যেতে পারে - যেগুলোকে আমরা নৃত্যনাট্য বলছি। কিন্তু ব্যাপক অর্থে সেগুলো কিন্তু নাটকেরই ান্তর্গত কেননা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে এই নৃত্যনাট্যকে রবীন্দ্রনাথ একটি আধুনিক নাট্যরূপ হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। নাটকে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন একটা বিশুদ্ধিকরণের মধ্যে নিয়ে আসতে এবং নাটক যেভাবে বা থিয়েটার ব্যাপক অর্থে সবধরণের শিল্পকে সমন্বিত করে গড়ে ওঠে তেমনি রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন যে নৃত্যও তার অন্তর্ভুক্ত হোক। তাঁর যে উদ্ভাবিত নৃত্যকলা, তা ভারতের বিভিন্ন নৃত্যশৈলী এমন কি ভারতের বাইরেও জাভা বা সুমাত্রা বা বালির নাচের যে শৈলীগুলো সেগুলোকে নিয়ে তার নির্যাসগুলোকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ রূপ। তাঁর কাছে নাটকের সেই আর একটা শরীরী রূপ হচ্ছে নৃত্যনাট্য এবং এই বিষয়ে তাঁর চমৎকার লেখা আছে অমিয় চক্রবর্ত্তীর কাছে চিঠিতে যেখানে তিনি বলছেন যে ‘ বাক্যের সৃষ্টির ওপর আমার সংশয় জন্মে গেছে’ এবং তিনি বলতে চাইছেন ‘আমার এই অদ্ভুত রেখানাট্যের কথা বলছি’। যে সময়ে তিনি ছবি আঁকছেন, সেই সময়েই তিনি নৃত্যনাট্য লিখছেন এবং পরিবেশন করছেন। এটা একটা বড় দিক। রবীন্দ্রনাথের নাটকের এটা একটা বড় পালাবদলের সময়। দুভার্গ্যজনক ভাবে এই ফর্মটা বা এই পথটা রূদ্ধ হয়ে গেছে রবীন্দ্রনাথেৰ সঙ্গে সঙ্গেই। এটা ধরে কিন্তু কেউ এগোন নি। মানে আমরা প্রতি বছর নিয়মমাফিক দেখতে পাই রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্রজয়ন্তীর উৎসব হয় বা কলকাতা শহরে পশ্চিমবঙ্গের এমন অনেক নৃত্য বা সঙ্গীতায়ন আছে যারা মাঝে মাঝেই তাসের দেশ বা শাপমোচন বা চিত্রাঙ্গদা বা শ্যামা মঞ্চস্থ করে থাকেন। কিন্তু সেগুলোতে সে অর্থে কোনো নতুন উদ্ভাবন নেই। সেগুলো ওই শান্তিনিকেতনের নৃত্যচর্চারই একটা রূপ। ব্যতিক্রম হিসেবে মঞ্জুশ্রী চাকী সরকারের কথা উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা একটা থিয়েটার ফর্ম হিসেবে এই নাটকগুলোকে দেখবার চেষ্টা করেছিলেন। ‘ তোমারি মাটির কন্যা’ নামে তাদের যে প্রয়োজনা ছিল - ‘চন্ডালিকা’কে মূলত ধরে ‘তাসের দেশে’র যে প্রয়োজনা ছিল - এই দুটোই আমি দেখেছি এবং দেখেছি যে সত্যিই আধুনিক ইউরোপীয় থিয়েটারে ন্দ্বপ্রন্দ্বান্দ্বজনপ্পন্দ্বন্দ্বন্দ্বন্দ্বন্দ্পু যে গুলো - তার সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথকে মেলাবার একটা চেষ্টা আছে। হয়তো তার মধ্যে কিছু বাড়তি ঝোঁক ছিল যা সবটা পছন্দ হবার নয়, কিন্তু একটা চেষ্টা ছিল নতুন একটা পথ খোঁজার ।এটাই উদয়শঙ্কর খানিকটা করেছিলেন। উদয়শঙ্করের নৃত্যের ধারাও কিন্তু বিলুপ্ত। যদিও তার পরিবারের ব্যাপক প্রভাব নেই - যেভাবে উদয়শঙ্করের প্রভাবটা তৈরী হয়েছিল। আমাদের থিয়েটার চর্চা বা নাটক চর্চার এই দিকটা কিন্তু রূদ্ধ হয়ে আছে। হ্যাঁ। নতুন কোনো শৈলী আবিষ্কারের দিকে যাওয়া হয় নি। রবীন্দ্রনাথকে, সে কারণে বলতে হয় যে স্বাধীনতার পূর্ববর্তী বাংলা নাটকে একটা আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা আলাদা করে উল্লেখের দরকারই পড়ে না যে রবীন্দ্রনাথের সমকালীন নাট্যকারদের মধ্যে এই চেতনা ছিল না। এই আধুনিকীকরণের চেষ্টাও ছিল না, চৈতন্যও ছিল না। আমরা যদি ওই সময়টা ধরি, ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ যে চিঠিটার

কথা আমি উল্লেখ করলাম সেটা সম্ভবত ১৯৩৬ এ - তা এই পর্বে যে সময়ে রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্য, যে সময়ে ছবি যে সময়ে 'পুনশ্চ' 'পত্রপুট' বা 'শ্যামলী'র কবিতা সেগুলো সব মিলিয়ে একটা আধুনিক রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সামনে দাঁড় করায়। সেই সময়ের সমসাময়িক নাট্যকার কারা দেখা যাচ্ছে মন্মথ রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এঁরাই বেশির ভাগ লিখছেন। অরোও কেউ কেউ আছেন যেমন অয়ষ্কান্ত বক্সী, নিশিকান্ত বসু রায়চৌধুরী যিনি 'বঙ্গে বর্গী' লিখে জনপ্রিয় হয়েছিলেন - এই নাটকগুলোর ভেতরে আমরা কিন্তু খুব কিছু নতুনত্ব পাই না। এর একটা বড় কারণ হচ্ছে যে এঁরা সবাই সমকালীন যে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছেন কোনোভাবে। ফলে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে যে ধরণের নাটক চ াওয়া হয়, যে ধরণের নাটক দেখতে দর্শক অভ্যস্ত এঁরা সেই অভ্যস্ত ধারতেই হাঁটছেন লেখালিখির জায়গাতে। এই সময়েতে মনে করা যেতে পারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা - তিনিও কিন্তু বেশ কিছু নাটক লিখেছেন পেশাদার রঙ্গ মঞ্চের জন্য এবং তারাশঙ্করের সাহিত্য যদি আমরা একদিকে রেখে তাঁর নাটকগুলো বিচার করতে যাই তাহলে দেখব ন াটকগুলো অনেক বেশি গতানুগতিক অনেক প্রথাগত যা সাহিত্যকার তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে নয়। সেখানে তিনি অনেক বেশি উন্মুক্ত। অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, উপন্যাসের ফর্ম বদলাবার কথা ভাবছেন। বিভিন্ন ধরণের গল্পে পরীক্ষা করছেন, নাটকে করছেন না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই পর্বে একমাত্র; ঠিক এই সময়টাই আমি বলব না যদি হিসেবের সুবিধার জন্য বনফুল কে আ মি এই সময়ের মধ্যে নিয়ে আসি তাহলে দেখব বনফুলের মধ্যে কিন্তু একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপার ছিল - বিশেষ করে তাঁর দশভান বলে যে ছোট ছোট দশটি নাটক আছে তার মধ্যে। একটু বেশি রকমের পরীক্ষা নিরীক্ষাই হয়ত আছে। যেমন একটা নাটক আছে তাঁর 'জল' বলে, যেখানে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন, দুটো পাওযার, তারা লড়াই করছে। উনি দেখাতে চেয়েছেন যুযুধান দুটি পক্ষ - মানে একদম রাজনৈতিক নাটক বলা যেতে পারে। পুরোটাই এত বেশি অ্যাবস্ট্র াক্ট, এতবেশি ভাববাদী, এতবেশি বিমূর্ত, মঞ্চে ওটা কী ভাবে গৃহীত হবে বলা খুব শক্ত। কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল, বনফুল তো ভাল কবিতাও লিখতেন। বনফুলের নাটকের মধ্যে কিন্তু একটা কাব্যনাট্যের পরীক্ষা আছে। এই কাব্যনাট্য কথাটা একটু গুত্বপূর্ণ। মন্মথ রায়ের নাটকেও একটা কাব্যময়তার দিক আছে, তাঁর সংলাপের বাঁধুনির ভেতরে তাঁর বিষয় উপস্থ াপনার ভিতরে। যদিও আমি আগেই বলেছি যে তার ফর্মটা কিন্তু প্রথাগত। সেই পঞ্চঅঙ্ক বা তিন অঙ্কের নাটক'। আমরা জানি যে তাঁর নাটকগুলি বিশেষ করে 'কারাগার'। ১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময়, গান্ধী আন্দোলনের পটভূমি তা যদি আমরা মনে রাখতে চাই যে সময় ক্ষিরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ আলমগীরের মত নাটক লিখছেন। এই নাটকগুলিতে একটি সমকালীন রাজনীতির ঢেউ হয়তো চলে আসছে। এই একই সময়ে শচীন্দ্র নাথের 'গৈরিক পতাকা' ও খানিকটা রাজনীতি সচেতন - যা গান্ধীজী বা নেতাজীর অনুকুলে যেতে পারে। কিন্তু ফর্ম এক, পুরানো যে ধরণগুলি ছিল ঐতিহাসিক নাটকে বা পৌরাণিক নাটকে - সেই ধারণাটাই আনা হচ্ছে হয়ত একটা অ্যালিগোরি তৈরী করা হচ্ছে, একটা প্রতীকায়ন ঘটানো হচ্ছে। কারাগরে যেরকম কৃষ্ণ কে স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে দেখানো হয়, নাটক যখন শেষ হয় তখন আমরা দেখতে পাই যে কৃষ্ণের আবির্ভাব হচ্ছে অর্থাৎ স্বাধীনতা আসছে। আমার ভাবতে আশ্চর্যই লাগে যে ব্রিটিশ রাজশক্তি একসময় 'নীলদর্পন' বা 'চাকর দর্পন' কিংবা এই ধরণের সুরেন্দ্র বিনোদিনীর মতো খুব অ্যাটাকিং, খুব প্রত্যক্ষ পলিটিক্যাল নাটক গুলিকে অ্যালাউ করেছে বা নাট্যনিয়ন্ত্রন আইন তৈরী করে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছে। সেই ব্রিটিশ সরকার এতপরে এসে 'কারাগার' বা ওই ধরণের নাটক গুলিকে এত গুত্ব দিলেন কেন? এই গুলিকে নিষিদ্ধ করা বা বাজেয়াপ্ত করলেন কেন? আমার কিন্তু মনে হয় না যে এই নাটকগুলি ততখানি আত্রমনাত্মক। কিন্তু এটা বার বারই হয়ে এসেছে। আমরা অ াগেই দেখেছি যে গিরিশ চন্দ্রের 'সিরাজদৌল্লা', 'মীরকাশীম' নাটক নিষিদ্ধ করা হচ্ছে - এই হচ্ছে একটা চেহারা। অন্য একটা চেহারা আমি একটু আগেই বনফুল প্রসঙ্গে বললাম, সেই চেহারাটা আমরা আরেকটু পরে দেখতে পাব বুদ্ধদেব বসুর ভেতরে, ঐ কাব্য নাট্যের ধারা। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে একটাই মাত্র পরিবর্তন সে সময় দেখা গেল রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে এক হচ্ছে যে খুব মোটা কথায় বললে বাংলা নাটক যদি শেক্সপীরিয় ধারাতে অভ্যস্থ থাকে তাহলে এই সময় খানিকটা ইবসেনীয় ধারার প্রভাব এসে গেল। অর্থাৎ নাটককে খানিকটা বাস্তববাদী করে তোলা, বাস্তবমুখীন করে তোলার প্রচেষ্টা ঘটেছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে যে নাটক অন্তত বাংলা ভাষায় মঞ্চ নিরপেক্ষতা প্রায় কখনই অর্জন করেনি। মানে মঞ্চের ওপর নির্ভরশীল নয়, তার একটা জোর আছে সাহিত্যিক জোর, সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই একমাত্র

ব্যতিক্রম, এছাড়া কোথাও নেই। সুতরাং এই যে বাস্তববাদিতার কথা বলছি এটাও খানিকটা মঞ্চের দাবীর কথা মনে রেখে। পুরোনো ধরনগুলোতে দর্শকের আর ভাল লাগছে না। কারণ ইতিমধ্যে অনেকগুলো বদল হয়ে গেছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়ে গেছে, একটা দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক পরিবর্তন এসে যাচ্ছে জীবন যাপনের ভেতরে। ক্ল্যাসিক্যাল যে রীতিটা খুব মহৎ ব্যক্তির জীবনের যে বিশাল ভাগ্য বিপর্যয়ের গল্প তার তুলনায় সাধারণ নরনারীর জীবনের আশা - নিরাশা, সুখ - দুঃখ এগুলো দেখতে চাইছি। সাহিত্য বিশেষ করে যে জায়গায় চলে আসছে। ত্রিশের দশকের সাহিত্য বিশেষ করে কবিতা বা গল্প বা উপন্যাসের কথা যদি ভাবি তাহলে দেখবো তা অনেক বেশি জীবনানুগ হয়েছে। যদিও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একথা বলছেন পরে এসে যে ওই কল্লোনীয় বাস্তবতাটা আসলে একধরণের রোমান্টিক রিয়ালিজ্‌ম, কিন্তু তা সত্ত্বেও তো সাধারণ মানুষের কাহিনী সাহিত্যে বিশেষ করে জায়গা নিতে শু করেছে। ফলে এক আধটা নাটকে এক আধজন অভিনেতার যে খ্যাতি তার বাইরে কিন্তু নাটকের একটা ধারা বদল হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় শিশিরকুমার ভাদুড়ীর যে বিখ্যাত নাটকগুলি - 'আলমগীর', 'তখত -তে - তাউস', 'রঘুবীর' এই নাটকগুলিতে শিশির কুমারের যে মহত্ব অভিনেতা হিসেবে, এই চরিত্রায়ণের যে মহত্ব তার একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। এই আকর্ষণ কিন্তু আর পাঁচ জনের নেই। আমি একথাও বলব যে একটু মনোযোগ দিয়ে শিশিরকুমারের ঐসব অভিনয় রীতি সম্পর্কে যা কিছু লেখাপত্তর আছে লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে সব জায়গায় একথা উল্লেখ করা হচ্ছে শিশিরকুমারের পোট্রেয়াল অফ দি ক্যারেক্টার, চরিত্রায়নের ধরনটা কিন্তু সাইকোলজিক্যাল। অর্থাৎ তিনি একটি চরিত্রকে তার মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা সহ উপস্থাপনা করছেন। এটাও একধরণের বাস্তববাদিতার ফল বলতে পারা যায়। তাঁর যে থিয়েটারের পরিবর্তন সেটাও কিন্তু অনেকখানি জীবনানুগ হতে পারছে, শিল্পসুষমা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে কারণ সেখানে ঐ দ্বন্দ্ব যে নাটকীয়তা, মানে তন্দ্বপ্রস্তত্তব্রন্ত ধরনটা এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সচেতনভাবে। যা করা হচ্ছে তা অনেক বেশি বিশ্বাস যোগ্য। যেমন তুলনা হিসেবে বলা যেতে পারে 'সীতা' নাটকের প্রথম দৃশ্যের কথা, যা মূল লিখিত নাটকের ভেতরে নেই। শুটা এরকম ভাবে হচ্ছে যে পর্দা খুলে যাচ্চে, একটা অল্প আলো পড়ছে উর্দ্ধ মঞ্চের ওপরে এবং দেখা যাচ্ছে একটি মেয়ে সেখানে দাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের 'হও হে অনাদি অতীত' কবিতাটি আবৃত্তি করে তার ওপর থেকে আলো নিভে যায় তারপর আলো আসে রামের প্রাসাদে। সেখানে দেখা যায় রামের কোলে মাথা রেখে সীতা ঘুমাচ্ছেন। পেছনে দেখা যাচ্ছে দ্বাররক্ষী রয়েছে আর কঞ্চুকী বা দূত সে দ্বাররক্ষীর কাছে এসে কিছু একটা বলল, দ্বাররক্ষী শুনলো, তাকে দাঁড়াতে বলল তারপর সে অনেকখানি ঘুরে বিভিন্ন চাতাল মঞ্চ পেরিয়ে এসে পৌঁছল রামের কাছে, তাকে কানে কানে কিছু বলল, রাম মুখ তুলে তাকালেন , শুনলেন তারপর চোখ তুলে ইশারা করলেন। প্রহরী আবার চলে গেল গিয়ে দূতকে বললো প্রবেশ করতে, দূত এল, এবার সে রামকে কিছু একটা সংবাদ দিচ্ছে। পুরো নাট্য ক্রিয়াটা হল একটা দীর্ঘ সময় ধরে। পুরোনো দিনের থিয়েটার কিন্তু এভাবে হত না। এই যে যাকে আমি বাস্তবতা বলছি, শিল্পের বাস্তবতা, যাকে বিশ্বাস যোগ্য একটা রূপ দেওয়া হচ্ছে এটা শিশিরকুমারের অবদান এবং তাঁর নিজের অভিনয় রীতি সম্পর্কেও একথাটা বার বার বলা হয়েছে। শম্ভু মিত্র বিশেষ করেই বলেছেন যে কীভাবে তিনি এক একটা চরিত্রের ভেতরের ঐ মনস্তাত্ত্বিক রূপগুলোকে অনায়াসে নিয়ে আসতে পারতেন। ধীরেন্দ্র নাথ দাস- অনুপ কুমারের বাবা তিনি শম্ভু মিত্রকে বলেছিলেন যে বড়বাবুর ভেতরে কতগুলো সুইচ আছে। এক একটা সুইচ্ টিপলেই এক একটা অভিব্যক্তি অনায়াসে চলে আসে। অর্থাৎ ক্ল্যাসিক্যাল অ্যাক্টিংয়ের যে ধারাটা তার সঙ্গেবাস্তবাবাদী অভিনয়ের ধারার মিশ্রনে শিশিরকুমার একটা রূপ তৈরী করেছিলেন এবং এব্যাপারে শিশিরকুমারের নিজের কথা শুনলে মনে হয় বা অন্যদের সূত্র ধরে মনে হয় এব্যাপারে শিশির কুমারের দুটো গু - একজন গিরিশচন্দ্র, অরেক জন রবীন্দ্রনাথ, গিরিশ চন্দ্রকে দেখা এবং বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে তাঁর অগাধ পান্ডিত্য - এই সব কিছুর মিশ্রণে এটা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যভাবে দেখা যায় যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রমশ, বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন এসে পড়ে শিশির কুমারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়ে যায়। তিনি ক্রমশ দর্শক হারাতে আরম্ভ করেন। কোথাও একটা চিগত পরিবর্তন হয়ে গেল এই ধারাটা আর চলছিল না। এর মধ্যে গণনাট্য আসে বিজন বাবু নাট্যকার হিসেবে হাজির হয়ে যান। এখানে উল্লেখ করা যায় যে গণনাট্য সংঘের যে প্রাথমিক অবস্থা, প্রগতি লেখক সংঘ যাকে বলা হয়, তারা যখন ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রীটে মিলিত হতেন তখন সেখানে প্রতিবুধবার একটা পাঠের আসর বসত। এবং সেখানে শুধু মাত্র নাটকই যে পড়া হত এমন নয় গল্পপাঠ করা হত, কবিতা পড়া হত। সবটার মূলেই কিন্তু ঐ দৃষ্টিভঙ্গী ঐ চেতনা কাজ করছে - একটা নতুন সময় নতুন আন্দোলনের কথা মনে রাখা

হচ্ছে। সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো লোক গল্প পড়েছেন আরো অনেক বিখ্যাত লোক গল্প কবিতা পড়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ উপলক্ষেই সেখানে উপস্থিত হয়েছেন যেখানে বিজন ভট্টাচার্য নবান্ন পড়েন এবং শুনে মানিক মন্তব্য করেন আপনি তো মশাই জাত চাষা, 'নবান্ন' সম্পর্কে আমরা কি করি। লক্ষ্য করার বিষয় 'নবান্ন' সম্পর্কে তো অনেক মিথ্ তৈরী হয় গেছে আমাদের মনে। 'নবান্ন' নাটকটাকে যদি একটু মনদিয়ে লক্ষ করা যায় তাহলে দেখা যাবে 'নবান্ন' কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন ধারার রচনা নয়। বাংলা নাটকের যে প্রচলিত ঘাত এই নাটক সেইখান থেকেই বেরিয়ে এসেছে। যেমন বলা যায় প্রধান সমাদ্দারের চরিত্র। তার মধ্যে কিন্তু একটা ট্রাজিক মহিমা আছে। যেটা পুরোনো ধারার অবদান বলা য ায়। এবং তার মধ্যে একটা কাব্যময়তাও আছে। অর্থাৎ ক্ল্যাসিক্যাল রীতিটা আমি তাকেই কাব্যময়তা বলছি। নতুনতর ব াস্তবিক কোনো কাব্যের অন্বেষণ দরকার ছিল, কিন্তু আরেকটা প্রথাগত ধারা চলে আসছিল। শিশির কুমারের অভিনয় যে অর্থে কাব্যময়, রবীন্দ্রনাথের অভিনয় যে অর্থে কাব্যময়, যে অর্থে গিরিশচন্দ্রের অভিনয় কাব্যময় ছিল সেই ধারাতেই প্রধ ান চরিত্র একটি কাব্যময় চরিত্র। সকলেরই জানা আছে, সংলাপগুলো পড়লেই বুঝতে পারা যায় যে সে একটা ট্রাঞ্জের মধ্যে আছে, সে খানিকটা সুস্থ খানিকটা অসুস্থ। সে কখনো কখনো গভীর অসংলগ্ন কথা বলতে থাকে, কখনো কখনো একেবারে বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কথা বলে। এটাকে আমি বলব প্রথাবদ্ধ ধারার দিক। দ্বিতীয় একটা কথা বলব এই ন াটকও কিন্তু অঙ্কে বিভক্ত - যদিও পাঁচ অঙ্ক নয়, তিন অঙ্কও নয় চার অঙ্কে বিভক্ত। একটা বদল, সেটা কী না একটু এপিসো ডিক ধরনের মতো, তার অন্য কারণ আছে। লক্ষ করার বিষয় আমার মতে 'নবান্ন' কিন্তু বিজন ভট্টাচার্যের ট্রেনিং পিরিয়ড। বিজন বাবুর নাটক উন্নত হয়েছে তার পরে। এই যে আমি বাস্তবিকতার ধারাটা বললাম পেশাদার মঞ্চে আমরা একধরনের বাস্তবতা পাচ্ছি। শচীন সেনগুপ্ত বা বিধায়ক ভট্টাচার্য বা তুলসী লাহিড়ীর নাটকে একধরণের বাস্তবতা পাওয়া যাচ্ছে। মাটির ঘর, রত্নদীপ, স্বামী - স্ত্রী, তটিনীর বিচার - এগুলোতে একটা রোমান্টিসাইজ করার ব্যাপার থেকেই যাচ্ছে। ব্যাপারটা হচ্ছে হয়ত সাধারণ নর নারীর কথাই আছে কিন্তু যে ধরনের সিচুয়েশনে , যে ধরনের কাহিনীতে, যে ধরনের সংলাপে, সেগুলো একটু সাজানো, যথেষ্ট জীবনানুগ নয় বলে মনে হয়, মনে হয় যেন খানিকটা দর্শকের ভালো লাগতে প ারে এই কথা ধরে নিয়েই বলা হচ্ছে। আর ওটাকে একটা ইবসেনীয় বাস্তবতা বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় ভীষণ রোমান্টিক মানুষ। রোমান্টিক কী অর্থে - তিনি মনে করছেন 'নবান্ন' নাটকের ভেতর দিয়ে আই. পি. টি. এ. চর্চার ভেতর দিয়ে জনজীবনের সঙ্গে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে নাটকের একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ গড়ে তোলা দরকার। এটা গণন াট্য সংঘের একটা উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে। একাজটা গণনাট্য সংঘ করে এসেছে। এখনও করে তখন আরো বেশি করে কর ার চেষ্টা করেছিল এবং আমরা দেখতে পাই প্রত্যক্ষভাবে গণনাট্যের লোক হোন বা না হোন যিনি এই গননাট্যের আদর্শে বিশ্বাসী তিনি এভাবেই দেখতে চান। তুলনা হিসেবে উৎপল দত্তকে মনে করা যায়। 'যপেন দা যপেন যা' বইতে উৎপল দত্ত কোট করছেন লেনিনের ভাষণ, কোট করছেন মাও - সে - তুঙের ইয়েনান ভাষণকে, সেখানে তিনি বলতে চেয়েছেন তোম াকে চাষীর কাছে গিয়ে ক্ল্যাসিক করতে হবে, শ্রমিকের কাছে গিয়ে শেক্সপীয়ার করতে হবে। শেক্সপীয়ারের নাটক কে তুমি শ্রমিক কে ভালো লাগাও। সেটাই তোমার কাজ, অর্থাৎ লেনিন বা মাও - সে- তুঙ কখনো একথা বলছেন না যে ক্ল াসিকালিটি কে বর্জন করে মর্ডানিটি তৈরী কর। শ্রমিকের কথা বলার জন্য তোমার পুরোনো ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে দাও - একথা বলছেন না, বরং ঐতিহ্যের একটা আধুনিকীকরণ ঘটানোর কথা বলা হচ্ছে সময়োপযোগিতার বিচারে কথা বলা হচ্ছে। এটি গণনাট্য সংঘের ঘোষিত নীতির মধ্যে ছিল। সেদিক থেকে 'নবান্নে'র 'প্রধান চরিত্রের মধ্যে কিংলীয়ারের মত যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা যায় তাকে আমি এক ধরণের ক্ল্যাসিক্যাল মেজাজ আমি বলতে পারি। সেই ক্ল্যাসিক্যালিটি বা রোমা ন্টিফিকেশন নিয়ে বিজন বাবু চাইলেন যে এই লোকায়ত জীবনের সঙ্গে এক একটা সম্পর্ক স্থাপন করবেন। এবং এক্ষেত্রে তাঁর তিনটি নাটককে গুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিৎ। তিনটে এবং তারপর একটা 'গর্ভবতী জননী' 'জীয়ন কন্যা' এবং ' দেবী গর্জন' এই তিনটে নাটক কে আমি একটা গ্রুপে রাখব, আর এর বাইরে 'মরাচাঁদ'। চারটে নাটক মেলালেই বিজন ভট্টাচ ার্যের যে দর্শন তা বেরিয়ে আসে। চারটে নাটকই লেকায়ত জীবন নির্ভর। প্রত্যেকটা নাটকেরই বিষয় সংগৃহীত হচ্ছে কে ান প্রত্যন্ত বাসীদের জীবন থেকে। 'গর্ভবতী জননী'র ক্ষেত্রে দেখানো হচ্ছে ব্রিটিশ শাসকদের হাতে নির্যাতিত সাধারণ ম ানুষ। 'জীয়ন কন্যা' কে তিনি পুরোপুরি রোমান্টিসাইস করেছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে। এবং বেদে যে স ম্প্রদায় যারা বিভিন্ন আচার - বিচার - সংস্কার নিয়ে বসবাস করে - বিশেষ করে সাপে - কাটার যে মিথটা আছে, সেটাকে

তিনি ব্যবহার করছেন; ঠিক যে ভাবে 'কারাগর' একটা মিথকে পুনর্গঠনের কথা ভাবে। তবে আরো বেশি অ্যানালিটিক্যাল বা জীবন নিষ্ঠ হয়ে করার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই নাটকগুলির মধে বিজন ভট্টাচার্য কিন্তু ওই ফর্মটাও আনার চেষ্টা করেছেন বিশেষ কেরে 'জীয়ন কন্যা'র কথা বলছি। ওই যে রবীন্দ্রনাথের কথা আমি বললাম সেখানে শরীর, শরীরের ছন্দ আরেকটা নাটকীয়তা তৈরী করতে পারে সেটা জীয়ন কন্যার ভিতরে ছিল। রবীন্দ্রনাথ সেটা করেছিলেন সেটা বিশুদ্ধ ভ াবেই রাবীন্দ্রিক হয়ত। রাবীন্দ্রিক শব্দটা উচচারণ করা ঠিক হচ্ছেনা হয়ত কারণ শব্দটাই ভুল। মানে আমি বলতে চাইছি রবীন্দ্রনাথ যেমনটা চেয়েছিলেন সেটা তো পিওর ফোক আর্ট নয়। কিন্তু বিজন বাবু যেটা চেয়েছিলেন সেটা একেবারে পিওর ফোক। একবার কথা প্রসঙ্গে আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল 'নবান্ন' নাটক যতখানি ছড়ানো 'দেবীগর্জন' ততটাই কমপ্যাক্ট - এটা কী করে হয়? তখন আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে 'নবান্ন' লেখা হয়েছিল একটা বাইরের তাগিদ থেকে। আর ' দেবীগর্জন' লেখা হয়েছে ভেতরের তাগিদ থেকে। স্বভাবতই এই কারণে দুটো নাটকের গঠন আল াদা হবে। দ্বিতীয়ত দুটো নাটকের সময়। মাঝখানে কুড়ি খানা বছর চলে গেছে। একজন নাট্যকার কিন্তু অনেক সংহত হয়েছেন তখন এবং একেবারে লোকায়ত জীবন এবং তার যে বিভিন্ন মিথগুলো আছে তাকে তিনি পলিটিক্যালি রি - ইন্ট ারপ্রেট করছেন। 'জীয়ন কন্যা'র কথা যেমন বললাম স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নাটকের গোড়াতেই ভারতের ম্যাপ কল্পনা করা হচ্ছে। 'গর্ভবতী জননী'তে একটা নতুন প্রজন্ম কে কল্পনা করা হচ্ছে। যে সাদাও নয় কালোও নয়, 'দেবীগর্জনে' আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা অত্যাচারের কাহিনী, শোষণের কাহিনী জোতদারদের শোষণ, সামন্তদের শোষণ। নাটক যখন শেষ হচ্ছে তখন দুর্গার প্রতিকল্প দিয়ে ভাবা হচ্ছে যে অসূর দমন হচ্ছে এবং মঞ্চের ওপরে তখন একটা কালী নাচ দেখানো হচ্ছে, কালী নাচটা কিন্তু পুলীয়ার বিষয় অথচ নাটকের পটভূমি বীরভূম, এটা কিন্তু এক ধরণের অ্যানাত্রনিজম। বলা যায় এটা ভুল, বীরভূমে কালী নাচ নেই - তাতে নাট্যকারের কিছু যাচ্ছে আসছে না। তিনি মনে করছেন এই লোকজীবনটা ওই ভাবে আলাদা আলাদা হয়ে নেই। যেকোন জায়গায় যে কোন জিনিষ চলে যেতে পারে আর যায় - ই তো তাই। সিলেটের একটা গান উত্তরবঙ্গে পাওয়া যায়। কী করে পাওযা যায়? গানটা ওরিজিন্যাল কোথায় তৈরী হয়েছে? এবিষয়ের লোক-সাহিত্য শিল্প বিষেশজ্ঞরা কিন্তু বিভ্রান্ত। উত্তরবঙ্গে আমি গানটা পেলাম ভাটিয়ালী সুরে ভাবলাম আ - হা এটা উত্তরবঙ্গেরি গান কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল ঐ গানটা সিলেটেও আছে। সমস্যাটা তখনই হবে যে গানটা আসলে কোথাকার। হয়ত এমন হয়েছে সিলেটের কোন মেয়ে বিয়ে হয়ে উত্তরবঙ্গে এসেছে। তার মাধ্যমে গানটা তৈরী হচ্ছে - এই যে আদান - প্রদানের ব্যাপারটা লোকজীবনের মধ্যে অনবরত চলছে। সেটাকেই তিনি এখানে ব্যবহার করছেন । বিশেষ করে 'মরাচাঁদ' খুব গুত্বপূর্ণ এই কারণে। বাংলা নাটকের ইতিহাসেও খুব গুত্বপূর্ণ নাটক হওয়া উচিৎ এটা। আসলে এক-একটা ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এক - একটা লেখা খুব জড়িয়ে যায়। নাটকের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ বললেই আমাদের 'রক্তকরবী'র কথা মনে হয়, দ্বিজেন্দ্র লাল বললেই মনে হয় 'শাজাহানের' কথা, বিজনবাবু বললে 'নবান্ন' ই ভাবি, শম্ভু মিত্র বললে 'চাঁদ বনিকের পালা' কিংবা উৎপল দত্ত বললে 'টিনের তলোয়ার' ভাবি। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বিজনবাবার 'নবান্ন' হওয়া উচিৎ নয় হওয়া উচিৎ 'মরাচাঁদ'। করণ এটা তাঁর নিজের সংকটেরও কথা অনেকটা। অথচ এই সব নাটকগুলো তত আলোচিত নয়। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথা ঠিকি বলেন, প্রায়ই এখানে ওখানে আক্ষেপ করে তাকে লিখতে দেখ া যায় যে বিজন ভট্টাচার্যকে ঠিকমত বিশ্লেষণ করা হয় নি। বিজনবাবু বাংলা নাটকের একটা ধারা তৈরী করতে পেরেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস।

গণ নাট্য তো একটা ইতিহাস - সেটা ভেঙে গেছে নানা কারণে। এর সঙ্গেই মেলানো যায় তুলসী লাহিড়ী, দিগেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বা আর যাঁরা প্রত্যক্ষ ভাবে গণনাট্যের নাট্যকার কিংবা খানিকটা গণনাট্য পন্থী নাট্যকার। তুলসী লাহিড়ী যেমন গণনাট্যের লোক নন কিন্তু 'প্রতীক' বা ' ছেড়াতার' কিছুটা গণচেতনার নাটক হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। এই একটা ফেস যায় চল্লিশের দশক ধরে। মনে রাখতে হবে পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক একটা শুধুমাত্র নাটকের ক্ষেত্রে নয়, বাঙ ালীর সমস্ত দিক থেকে সবচেয়ে সুবর্ণ যুগ যাকে বলা যেতে পারে। 'পথের পাঁচালী'র মতো ছবি হচ্ছে , সমস্ত লেখকরা তখন সক্রিয়। জীবনানন্দের চুয়ান্ন সাল তার আগে পর্যন্ত তাঁর কবিতা, সব কবিরা - বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখদের রচনা, সিনেমা - সাহিত্য সমস্ত দিক থেকে সুবর্ণ যুগ। নাটকের ক্ষেত্রে শম্ভুমিত্রের সব অবিস্মরনীয় প্রয়োজন গুলো, উৎপল দত্তের এল.টি.জি. শু হয়ে যাওয়া সবটাই পঞ্চাশ - ষাটের ব্যাপার। ফলে এই সময় থেকেই বাংলা নাটকের চেহারাটা আর সে

াজা নয়, যেটা আমরা আগের সময় অবধি বলতে পারি। এই সময়ের একটা খুব গুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চুয়ান্ন সালে বহুর পীর 'রক্তকরবী' প্রয়োজনা। রবীন্দ্রনাথ একটা জায়গায় এসে শেষ করে দিয়েছিলেন, 'রক্তকরবী' তিনি মঞ্চস্থ করেন নি, করলেই বা কী হোত? রবীন্দ্রনাথ তো আর থিয়েটারের নতুন কোন দিশা খোঁজবার জন্যে বা তাঁর প্রযোজনা সত্যি তা করে দিয়ে যেতে পারত কিনা একথা ভাবার কোন মানেই নেই কারণ থিয়েটার করাটা রবীন্দ্রনাথের অন্যতম কাজের মধ্যে পড়ত না। কিন্তু একটা নতুন ধারার নাট্যচর্চা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে 'রক্তকরবী' থেকে। যে ধারাটা গণনাট্যের বাইরে নয় কিন্তু গণনাট্যেরই আরও উন্নত এবং পরিশুদ্ধ একটা রূপ। একটা কথাতো ভাবতেই হবে যে কোনটা আগে - পাত্রাধার তৈল ন া তৈলাধার পাত্র। যদি উদ্দেশ্য হয় শিল্প করার দায়বদ্ধতাকে ভিতর থেকে প্রকাশ করার, সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখার তবুও যে মাধ্যমটায় কাজ করব তারও নিজস্ব কিছু দাবী আছে। সেগুলো না করলে সেটা একটা প্রচারহয়ে যাবে, প্রোপ াগ্যান্ডা হয়ে যাবে, নাটক হবে না। নাটককে আগে নাটক হতে হবে তারপর তার মধ্যে প্রচার বা স্লোগানের কথা আসবে। ব্রেখ্‌ট যার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। তিনি তাঁর স্লোগানের কথা গুলো একেবারে নাটকীয় ফর্মে, নতুন ফর্ম আবিষ্কার করে নিয়ে বলেন, যা দর্শকের কাছে একই সঙ্গে চিত্তাকর্ষক লাগে এবং তা জনপ্রিয় (ত্নপ্সন্মাত্তপ্তক্তজগ্ন হয়। এই যে জায়গায়টা , 'নবান্নে'র পরে গণনাট্যের সেইরকম উজ্জ্বল ইতিহাস আমরা পাচ্ছি না। বলতে পারা যায় 'রক্তকরবী' সেই ইতিহাসটাকে সম্পূর্ণতা দিল। রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক একটা রূপ দিচ্ছে - একটা বন্দ্বপ্রব্ধ যে অতখানি ত্মনন্তড় হতে পারে যা আগামী একশো বছরের সংকটকে বলতে পারছে, যে কোন একটা সংলাপ ধরলেই বোঝা যায় সভ্যতার সংকটের উপস্থিতি -সেট া জানা যাচ্ছে 'রক্তকরবী'র প্রযোজনা থেকে। এই কারণেই শঙ্খ ঘোষ বলেছিলেন 'রক্তকরবী'র দশটা ক্লাশের থেকে বহুর পীর এক রাতের অভিনয় দেখা অনেক বেশি মূল্যবান। ক্লাশ থেকে যা জানা যাবে না অভিনয় থেকে তা জানা যাবে - এতে া জ্যান্ত এতবেশি প্রাণবন্ত কাজ। এটা ধরে নেওয়া যেতে পরে রক্তকরবীই বাংলা নাটকেরও একটা দিশা তৈরী করে দিচ্ছে (শুধু থিয়েচারের কথা বলছি না)। নতুন মৌলিক নাট্যকারদের কাছে একটা শিক্ষা হিসাবে নিশ্চই আমরা 'রক্তকরবী' কে দেখতে পারি। কিন্তু আমরা দেখছি এই সময় থেকে কিছু কিছু পরীক্ষার ব্যাপার হচ্ছে। একটা দিকে হয়েছে, এই সম্প্রতি 'চেনামুখ' একটা দু'দিনের অনুষ্ঠান করল, 'বাংলা কাব্য নাটকের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনা'। এখনতো আসলে কোন কিছুরই অস্তিত্বও নেই সম্ভাবনাও নেই। ফলে এগুলো আলোচনা করতে হয়, আলাদা করে সেমিনার করতে হয়, অনুষ্ঠান করতে হয়। কিন্তু আমি যে সময়টার কথা বলছি সে সময়টা কাব্যনাট্যের সুবর্ণ যুগ ছিল। আমি রক্তকরবীকে অবশ্যই একটি কাব্য নাটক বলতে পারি - কাব্য নাটক, যা একই সঙ্গে কবিতাও বটে, নাটকও বটে। বুদ্ধদেব বসুর নাটকগুলিও আমরা ঐ সময় থেকেই পাচ্ছি। উনি একাধিক পৌরাণিক নাটক লিখছেন। অবশ্য একটা গন্ডগোলের জায়গা কিন্তু বুদ্ধদেব বসুতে আছে। সেটা হচ্ছে তিনি নাটকের গঠনে খুব নতুনত্ব আনতে পারেন নি, আনতে চান নি আসলে - কেননা বুদ্ধদেব বসু পুরোটাই গ্রীক নাটকের ফরমেটে ভাবছেন। তাঁর প্রত্যেকটা নাটকের আগেই এরকম উল্লেখ করা আছে। এবং সেই কারণেই এত অ াটোসাঁটো রাখতে চান। তিনি একটি লাইনের বদল পর্যন্ত পছন্দ করতেন না। এখন যাঁরা বুদ্ধদেব বসু অভিনয় করছে তিনি বেঁচে থাকলে এতটা স্বাধীনতা পেতেন কিনা সন্দেহ, একটা শব্দের বদল করতে দিতেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাজটাই করছেন, সভ্যতার ,সংকটই দেখাচ্ছেন মহাভারতের এক - একটা অধ্যায় তুলে এনে গঠনের ভেতরে। বুদ্ধদেব বসুর নাটক গুলি দেখলে মনে হবে একই নাটকের বিভিন্ন পাঠ - 'প্রথম পার্থ', 'অনাম্নী অঙ্গনা', 'সংক্রান্তি', 'কালসন্ধ্যা', সব যেন এক সিরিজের নাটক। এগুলো অবশ্য তখনও মঞ্চে গৃহীত নয়। আর আমরা পেয়ে যাচ্ছি বাদল সরকারকে। Most Important নাট্যকার। একদিকে যদি বিজন ভট্টাচার্যকে রাখতে চাই তাহলে অন্যদিকে বাদল সরকারকে রাখতেই হবে। ব াদল সরকারকে রবীন্দ্রনাথের পর সেই অর্থে শ্রেষ্ঠ কাব্যনাট্য কার বলা যেতে পারে। যদি কাব্য নাট্য বলতে আমি একটু স্ব াধীন, একটু বেশি উদার কিছু ভাবি, যা এলিয়টের সূত্র ধরেই বলতে পারা যায়। কোন কাব্যনাটকের অনুষ্ঠানে বাদল সরকার কেন থাকেন না এ প্রশ্ন তোলা যায়। আমি যে অনুষ্ঠানের কথা বলছিলাম সেখানে কিন্তু বাদলবাবু নেই। যদিও অ ালোচনার শুতে ইন্দ্রাশিষ লাহিড়ী 'যদি আর একবার' নামটা বিশেষ করে উল্লেখের খুব একটা দরকার ছিল না। ছন্দে লেখা বলেই কাব্য নাটক বলে বিবেচিত হবে এমন কোন কথা নেই। তাহলে তো গিরিশ বাবুদের সময়কার অনেক ন াটককেই কাব্যনাটক বলে অভিহিত করতে হয়। কাব্য নাটকের কাব্যত্ব তো অন্যত্র যেটা তার 'এবং ইন্দ্রজিতে' আছে, 'সার া রাত্রিরে'র মধ্যে আছে। এগুলোতে কবিতা আছে, ভীষণ Rich কবিতা এবং ষাটের দশকের একেবারে উপযুক্ত কবিতা।

সেটা 'কৃত্তিবাস' দের সময় যারা পুরোনো ধারা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। আক্রমণ করছে আগের কবিদের। সমস্ত ধ্যান ধারনাকে ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করছে। জীবনানন্দ ছাড়া আর কাউকে তাঁরা গ্রহণ করছেন না। রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করছেন এবং সেই বর্জনের প্রথা বা অভাস এখনও তঁদের মধ্যে রয়ে গেছে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় খালাসীটোলায় জীবন ানন্দের জন্মদিন পালন করছে। তো ওই যে সময়টা তখন কবিতার ভাষাও বদলাবে - এটাই মূল কথা। এটা কিন্তু বাদলব াবুর নাটকে ভীষণভাবে আছে।

'এবং ইন্দ্রজিতে'র এক - একটা ছোট্ট ছোট্ট কথা - তার মধ্যেও অসম্ভব কবিতা আছে। একে বারে গোড়াতেই যেখানে প্রশ্ন করা হয় আপনার নাম? আপনার নাম? সেখানে চতুর্থ ব্যক্তি যখন বলে নির্মল তখন প্রশ্নকর্তা বলে না অমল, বিমল, কমল, নির্মল এমন হতে পারে না, নিশ্চয়ই অন্য কোন নাম আছে, বলুন কী নাম আপনার। সে বলে ইন্দ্রজিৎ রায়। তবে কেন অ াপনি নির্মল বলেছিলেন। ভয়ে। কিসের ভয়ে। নিয়মের বাইরে যাবার ভয়ে। অপনার বয়স কত। জানিনা। জন্ম কবে - এই ভাবে সব প্রশ্নের উত্তরেই 'জানি না,' 'জানি না' বলতে থাকে। মৃত্যু। এখনও হয়নি। ঠিক জানেন। না জানি না। ওই যে ধরণটা, একটা অভ্যস্থ বাস্তবতার বাইরে এক মুহূর্তেই নিয়ে চলে গেল। এটাকে শুধমাত্র ফর্ম হিসাবে দেখলে হবে না। এট াকে একেবারেই অ্যাবসার্ড নাটক হিসাবে দেখা উচিৎ। আর অ্যাবসার্ড নাটকের Philosophy একেবারেই আলাদা। যা বাদল সরকারের Philosophy নয়। অ্যাবসার্ড নাটক মূলত কী করতে চেয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবী মূলত অ ামেরিকা দেখতে চেয়েছে যে আমাদের এই পৃথিবীতে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, বিজ্ঞান এমন একটা পৃথিবী তৈরী করেছে যাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সবার আগে মুছে গেছে এবং এই পৃথিবীতে মানুষ সবচেয়ে বেশি অসহায় - আবার মানুষের অসহায়তা প্রমাণ করবার জন্য সবচেয়ে ভাল হচ্ছে মানুষকে নিয়ে রগড় কর। আমি 'রগড়' শব্দটাই ব্যবহার করছি। পুরোটাই একটা হাস্যকরতা যা দিয়ে একটা দুঃখ চাপা দেওয়া আছে। ব্যাপারটা কিন্তু ট্র্যাজী-কমেডি নয়। কিন্তু নিরর্থক-মানুষের নিরর্থকতা প্রমাণ করা। এটা করতে গিয়ে ফর্মকে ভেঙে দেওয়া, ইচ্ছাকৃত ভাবে কতগুলো জিনিষকে নিয়ে আসা, বাদল সরকারের ব্যাপারটা সেরকম নয়। বাদল সরকারের নাটক আমাদের মুল্যবোধ গুলোকে ভেঙে বেরিয়ে চলে যায় না, ইন্দ্রজিতের যে সংকট তা একজন বাঙালী যুবকের সংকটে পরিণত হয়। এবং নাটকটা শেষ পর্যন্ত নেতিবাদও নয়। তোম াকে জীবনে চলতে হবে একথা বলে - তীর্থ নয় তীর্থপথ আমাদের মনে যেন রয়। মানে একটা চলার কথাই বলা হয়, আশ ার কথাই বলা হয়। যেরকম রক্তকরবীতে বন্দীশালা ভাঙতে যাওয়ার ব্যাপারটা হয় এখানেও তেমনি বলা হয় তোমাকে চলতে হবে।

এই সবের মধ্য দিয়ে একেবারে শহর জীবনের সংকট প্রকাশ করছেন বাদল সরকার। আর গ্রাম জীবনের সংকটকে প্রকাশ করছেন বিজন ভট্টাচার্য। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে দুটো মে। কিন্তু বাদল সরকারের নাটক দেখতে আমাদের conventional থিয়েটার প্রস্তুত নয় ফলে তিনি একটা অন্য ফর্ম খোঁজেন। এবং যেহেতু সেটা খুঁজেছেন সেটাকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিজেও অনেকগুলো গন্ডগোলের মধ্যে তিনি জড়িয়ে গেছেন। এটা একটা ক্ষতি আমাদের দিক থেকে। মঞ্চ যদি সেভাবে প্রস্তুত হতে পারত তাহলে বাদল সরকারের কাছ থেকে আরো ভাল নাটক পেতে পারতাম। তথ্য পরিসংখ্যান মিলিয়ে দেখলে দেখতে পাব যে মোহিত চট্টোপাধ্যায় বাদল সরকারের একটু আগেই আসেন কিন্তু আলোচনায় তাঁর নাম পরে অ াসে তার একটা কারণ মোহিত কিন্তু কৃত্তিবাস গোষ্ঠীর একজন - সেই অর্থে প্রথাভাঙা কবিতার সূত্রে নাটক লেখেন মো হিতও ঐ ধরণের নাটক লেখার চেষ্টা করছেন, সেখানে নাটক একেবারে কবিতা, নাটকের কবিতা। তাই নাটকের কবিতা তাঁর কাছে যত গুত্বপূর্ণ নাটকের ফর্মটা ততটা নয়। যদিও শেষ পর্যন্ত বাদল সরকার নন মোহিত চট্টোপাধ্যায় নাটকের ক াছে আত্মসমর্পণ করেন। একটা সময় গেছে কলকাতার প্রায় সাতটা - আটটা দল মোহিতদার নাটক করছে, সেগুলোকে আমি তুচ্ছ করবো না, যদি রূপান্তর বা অনুবাদ নাটকও হয় সেখানেও কিন্তু মোহিতাদার কলমের জোর প্রকাশ পায়। যেমন, 'তখন বিকেল' - দুটি বৃদ্ধ নর - নারীর কাহিনী, কিন্তু এত মিষ্টি নাটক রোমান্টিক নাটক বাংলায় খুব কম লেখা হয়েছে। শুনেছি এটা আসলে একটি রাশিয়ান Play ছিল। আমি পড়িনি। কাজেই মোহিতদা কতটা সংযোজন করেছেন কতটা অনুসরণ করেছেন জানিনা, তবু আমি মনে করি এ নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের কলম থেকেই বেরোবে। তাছাড় াও 'তখন বিকেল' আমার আরও প্রিয় নাটক এই কারণে যে খালেদ চৌধুরীর গত দশ - বারো বছরে আমার মনে হয় শ্রে ষ্ঠতম মঞ্চ চিত্রায়ন।

সম্প্রতিক কালের নাটকগুলির মধ্যে 'বিপন্ন বিস্ময়ের' নাম করতে হয়। গল্পটির মধ্যে কোন নভেলটি নেই কিন্তু বলার মধ্যে অসামান্যতা আছে। এটাকেই আমি কবিতা বলছি। পঁচিশ বছরের আগের খুন হয়ে যাওয়া ছেলের খুনি যখন পঁচিশ বছর পরে আসে তখন আমি তাকে কীভাবে দেখব। এই গড়ন, বলার ভঙ্গি এটাই মোহিতদার নভেলটি। অথচ নাটকটি মৌলিক নয় তার প্রমাণ আমার আছে। আমি 'ফুল ফুটুক' নামে একটি নাটকের সমালোচনা লিখি। সেটার সঙ্গে বিপন্ন বিস্ময়ের একটা নির্যাস মিল পাই যদিও নাটক দুটি সম্পূর্ণ আলাদা।

আমি বাদ দিয়েছি উৎপল দত্তকে। উৎপল দত্ত সম্পর্কে এটা বলাই যায় যেটা গিরিশ করনাড বলেছিলেন, উৎপলবাবু হচ্ছেন উনিশ শতকের গিরিশ চন্দ্রের মত - যিনি নিজেই নাট্যকার, নিজেই অভিনেতা, নিজেই পরিচালক। তাঁর নাটক অন্য কেউ অভিনয়ও করতে পারবে না পরিচালনাও করতে পারবে না এবং করলে কখনোই কেউ মনে করতে পারবে না যে উৎপল দত্তের মত হল। নাট্যকার হিসেবে উৎপল দত্তকে আমি খুব সম্মানের চোখে দেখি না, সাতখন্ড নাটক সমগ্র বেরোনোর পরও দেখি না। বেশ কিছু নাটক আছে যা উনি না লিখলেও পারতেন। অনেক নাটক পড়বার পর মনে হয় এটা আমি আগেও পড়েছি, আসলে তিনি তো একটা জায়গায় স্থির হয়ে আছেন। শেষ গিয়ে এই বলব - এরকম একটা ফরমূলা একটা ছক তিনি এঁকে রাখেন। অবশ্যই অসামান্য কয়েকটা নাটক তো আছেই - 'অঙ্গার' বা 'কল্লোল' বা ' টিনের তলোয়ার' বা 'ব্যারিকেড' এরকম আট - দশটা নাটক অবশ্যই বলতে হবে। কিন্তু উৎপল দত্তকে আমার মনে হয় বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে একটা ব্যতিত্রম। এর ঠিক আগেও নেই। পরেও নেই। কখনো মনে হয় as an action ভীষণ ভাবে মিলে যায় গিরিশ চন্দ্রের সঙ্গে, কখনো মনে হয়ব্রদ্ধ thinker মধুসূদনের কাছাকাছি। এসব মিলিয়েই উনি ব্যতিত্রম। ওঁর কোনো ধারাবাহিকতা নেই, তাই ওঁর মৃত্যুর পর দ্রুত শেষ হয়ে যায় ওঁর ধারা। নাটকের আলোচনা করলেও থিয়েটার বাদ দিয়ে তো তা আর হয় না, তাই বলব এটাও লক্ষণীয় সত্তরের দশক পর্যন্ত তিনটে ব্যক্তিত্ব ছিল - শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ। আশির এবং নববইয়ের দশকে একমাত্র শম্ভু মিত্র ছাড়া উৎপল দত্ত এবং অজিতেশের উত্তরাধিকার ধারা লুপ্ত।

এর পরে যদি আসি মানে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের পরে সেখানে মনোজ মিত্র, দেবাশীষ মজুমদার উল্লেখযোগ্য নাট্যকার। মনোজ মিত্রের নাটক প্রথম দিকে আমার মনে হত অনেক বেশি দর্শক ধরার ফাঁদ আছে। লোকটির সবচেয়ে বড় গুণ তিনি নাটক জমাতে পারেন। সংলাপের প্রাখর্য আছে, সিচুয়েশন মেকিংয়ের ক্ষমতা আছে কিন্তু খুবই স্থূল কাজ এবং এখনও মাঝে মাঝে তা উঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসে। ক্রমে ক্রমে অভিনেতা হিসেবে উনি একটা জায়গা পেয়ে গেলেন বিশেষ করে সাজানো বাগান থেকে। এরপর থেকে দেখা যায় মনোজ মিত্রের নাটকেরও কিন্তু একটা পরিবর্তন হয়ে গেল। আগের নাটকগুলো মোটামুটি একই ধরনের - কেন্দ্রিয় চরিত্র একটু বোকা বোকা, স্মার্ট নয়, বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে উদ্ধার পেয়ে যায় যেহেতু সে ভাল লোক। ' কেনারাম বেচারাম', 'পরবাস' একই ধাঁচের একমাত্র ব্যতিত্রম বলা যায় 'চাক ভাঙা মধু'। 'চাক ভাঙা মধু' দেখে শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে তারাশঙ্করের উত্তরাধিকার। অমার তো মনে হয় বিজন ভট্টাচার্যেরও উত্তরাধিকার। মনোজ বাবুর পরিবর্তন হয়েছে আশির দশকে এসে। তিনি ঐ কাব্যধর্মীতার দিকে গেছেন। 'শোভা যাত্রা', ' অলকানন্দার পুত্র কন্যা' এই নাটকগুলো থেকে একটা বাঁক এল। আর একটা নাটক আমার খুব প্রিয় যদি ও তার গঠন সর্ম্পকে আমার কিছু আপত্তি আছে তা হল 'গল্প হেকিম সাহেব'। এখানেও কবিতা আছে। নাটকে যদি কবিতা না থাকে তা কিন্তু কালের বিচারে টেকে না। তবে মনোজ মিত্রের কাছ থেকে ভালো নাটক, আরো ভালো নাটক পাওয়ার প্রত্যাশা আছে।

এদের সঙ্গে দেবাশীষকে আমি রাখব। 'অমিতাক্ষর' এবং তার আগে 'দান সাগর' এগুলোতে কাব্য গুণ আছে। আসলে দেবাশীষ মূলত একজন কবি আর তাঁর নাটকে সেই কাব্যময়তা আছে। এগুলো ফর্মের দিক থেকে সেরকম না হলেও কাব্যগুণ অসামান্য। 'অমিতাক্ষর' নাটকের সাবজেক্ট ম্যাটার তো অভূতপূর্ব। দেবাশীষের 'তাম্রপত্র' নাটকটি ভারতবর্ষে সুপরিচিত। এরপর অবশ্য অনেক নাটকে এই কবিতার ব্যাপারটা আরোপিত হয়ে গেছে। তবে 'রাঙামাটি' তে এসে আবার সেই নির্যাসটা আমি পেয়েছি। এদের পরে যাঁদের বলতে পারি আশির দশকের উল্লেখ্যযোগ্য নাট্যকার তাঁদের মধ্যে চন্দন সেন এক নম্বর। তারপর আসবে ইন্দ্রাশীষ লাহিড়ী। দেবাশীষদের সময়কার হলেও চন্দন সেন নাট্যকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন অনেক দিন পরে এবং যে নাটকগুলি লিখে তিনি পরিচিত হয়েছেন সেগুলো সম্বন্ধে আমাদের আপত্তি কোথাও চাপা থাকে না। নাটকগুলি একটু সরলী করণের দিকে গেছে। আসলে দর্শক যা সহজে গ্রহণ করতে পারে

তার দিকে ঝোঁক রেখেই হয় তো এই প্রচেষ্টা - এতে অবশ্য আপত্তির কিছু নেই, আমি বলতে চাই এই নাটকগুলি আম াকে উদ্বুদ্ধ করে না। একটা সহগকট প্রভৃতি চিত্রিত। তবে সাধারণ ভাবে তাঁর সব নাটকই একটু জনপ্রিয়তার দিকে হাঁটছে। ইন্দ্রাশীষ প্রথমেই একটা সাড়া জাগিয়ে দিতে পেরেছিল। ও ছিল ইংরাজী সাহিত্যের ছাত্র। অর ওর আমেরিকান সাহিত্য এত বেশি পড়া যে ও প্রথমেই নাটকে একটা আধুনিক রূপ দিতে পেরেছিল। যদিও ওঁর প্রথম উল্লেখ যোগ্য নাটক যেটা সেটা অনেকেই জানে না, তা হল 'জননী' নামে একটা ছোট নাটক, যেটা ও যাদবপুরে পড়ার সময় লিখেছিল। কিন্তু ওঁর যেটাতে নাম হয় তা হল একটি রূপান্তরিত নাটক। 'ইচ্ছেগাড়ি'। টেনিস উইলিয়ামসের নাটক। ইন্দ্রাশীষের নাটক লেখার হাত আছে। মানে ওঁর সংলাপে একটা ওজস্বিতা আছে একটা কাব্যময়তা আছে এবং এর সঙ্গে আছে নাট্যদ্বন্দ্ব কিন্তু পরের দিকে ইন্দ্রোশীষ পরনির্ভরশীল হয়ে পড়ে মানে কোন লেখা সামনে না পেলে ও যেন রূপ দিতে পারে না। তবে ওঁর শেষ নাটক 'লজ্জাতীর্থে' ইন্দ্রাশীষকে বেশ খানিকটা পাওয়া যায়।

এছাড়াও ভাল নাট্যকার আরও আছে, শুধু যে কলকাতায় আছেন তাও নয়, কলকাতার বাইরেও যথেষ্ট সংখ্যক ভাল ন াট্যকার আছেন। অমি বেশ কিছু পড়েছি, দেখেছি এবং চেষ্টা করি যাতে ঐ সব নাটক সম্বন্ধে একটু ওয়াকিবহাল থাকা য ায়। কিন্তু আমি ঠিক বুঝি না মফস্বলের নাট্যকাররা কিছুতেই আমাদের সঙ্গে মিলতে চায় না। কিসে যে বাঁধা বুঝি না। তবে ভাল নাটক ওখানেও হয়। শুধু নাট্যকার নয়, নির্দেশকও আছেন যাঁরা ভাল নাটক রচনা করেন। তবে তাদের তো অ ার আলাদা করে নাট্যকার হিসাবে ধরা হয় না। এঁদের মধ্যে সংগ্রামজিৎ সেনগুপ্ত আছেন, রমাপ্রসাদ বণিক আছেন। এঁর া লেখেন ভাল তবে এদের পরিচয় মূলত নির্দেশক হিসেবে। এছাড়া হর ভট্টাচার্য অনেক দিন লিখছেন না। ওঁর 'অদ্ভুত আঁ ধার' বিভাস চক্রবর্তী করেছেন। হরর নাটক সম্বন্ধে বলা যায় খুব মেধাবী লেখা। তীর্থঙ্কর চন্দ খুব ভাল নাটক লেখেন। মফস্বলের অনেকগুলি দল ওঁর নাটক করে।

কলকাতার দল ও করে মাঝে মধ্যে। আর এই মুহূর্তে সৌমিত্র বসুর নাম বলব। ওঁর 'বিজড়িত' নাটকটা আমার পড়া হয় নি। তবে 'যযাতীয়' নাটকটি নাটক হিসেবে বেশ প্রশংসিত। সৌমিত্রর হাতে কমেডি খুব ভালো আসে তাছাড়া সংলাপ দক্ষতা তো আছেই। এই প্রজন্মের নাট্যকারদের মধ্যে উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় খুব ভাগ্যবান। উজ্জ্বল বহু প্রসবী নাট্যকার, প্রচুর লেখে এবং একসঙ্গে চার পাঁচটা দল ওঁর নাটক করে। উজ্জ্বলের আমি যেটা শেষ নাটক দেখেছি বহুরূপীর 'ধৃতবনসি' - আমার একদম ভালো লাগেনি। খুব খারাপ লেগেছে। আমার মনে হয় না উজ্জ্বলের এত নাটক লেখা উচিত। একটা নাটক মাথায় এলেই সেটা লিখে ফেলতে হবে এমন কোন দায়বদ্ধতা আছে কি? একটু গুছোতে হবে তো। আসলে আমার মনে হয় ও খুব তাড়াহুড়ো করে ফলে শেষে একটা তালগোল পাকিয়ে যায় যেটা ধৃতবনসিতে লক্ষিত।

তণ প্রজন্মের এই সব নাট্যকাররা লিখলেও এখনও মোহিত চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, দেবাশীষ মজুমদার লিখেছেন, মনোজ মিত্র কম লিখলেও লিখেছেন, নিজের দলের জন্যই লিখেছেন। এখানে আমার একটা অভিযোগ, মনোজ মিত্রের মাপের একজন নাট্যকারের নাটক শুধু তিনিই করবেন এটা ঠিক না। দেবাশীষের সম্পর্কেও একই কথা খাটে। যাঁদের হাত থেকে ভাল নাটক লেখা হয় তাঁদের নাটকই তো বেশি করে করা উচিত। সেটা না হলে তো নাটকের কোন উপকার হয় না। থিয়েটার যাঁরা করেন - নির্দেশকদের এই ক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব থাকে। যাঁরা ভাল লেখেন বা লিখতেন তাঁদের একটু ল ালন করা পরিচালকদের এই ক্ষেত্রে একটা দায়িত্ব থাকে। যাঁরা ভাল লেখেন বা লিখতেন তাঁদের একটু লালন করা পরিচালকদের কাজ। আবার নাট্যকারদেরও দায়িত্ব আছে। একটা নতুন ভাবনার দিকে যাওয়া, প্রথাবদ্ধতার দিকে না হেঁটে বা যতটুকু থিয়েটার নিতে পারছে ততটুকুর মধ্যে না রেখে আরও একটু ছড়ানো যায় কিনা তা দেখা।

এখানে একটা প্রসঙ্গ বলে শেষ করব - একটা লক্ষণ দেখা গেছে তা হল বিশুদ্ধ অর্থে নাটক নয় এমন কিছুকেও নাটক বল া। এটা মনে হয় সারা পৃথিবী জুড়ে যে কালচারাল্ স্টাডিস্ - এর ঝোঁকটা তৈরী হয়েছে তারই একটা এফেক্ট বলা যেতে পারে। যেমন, 'মেঘনাদবধ কাব্য' কে নাটক হিসেবে মঞ্চস্থ করা হল, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কে নাটক করা হল। এবং দুটো প্রযোজনাই খুব গুত্বপূর্ণ প্রযোজনা। বাংলাদেশে সেলিম আলাদিন এই চেষ্টাটা চালিয়েই যাচ্ছেন যে তিনি তাঁর নাটক ভ াঙতে ভাঙতে কোথায় যে নিয়ে যেতে চাইছেন, আমার তো আশ্চর্যই লাগে। 'হরগজ' বা 'প্রাচ্য' কী করে যে মঞ্চে করা সম্ভব আমি তো কল্পনাই করতে পারি না। 'হরগজ' তো পড়লে মনে হয় একটা সিনেমা দেখছি। কোন সংলাপই নেই পুরে াটাই Narration, বিবৃতি । পুরোটাই একটা টর্নেডোর এফেক্ট। সে এক ভয়ঙ্কর লেখা। শুনলাম একজন সুইডিশ মহিলা ন

াটকটির অনুবাদ করেছেন এবং মঞ্চে উপস্থিত করেছেন। দেখার সৌভাগ্য অবশ্য হয় নি জানি না হবে কিনা। আসলে ন াটককে আর নাটকের জায়গায় থাকলে চলবে না - নাটকের স্বার্থেও বটে, থিয়েটারের স্বার্থেও বটে। নাটককে ভেঙে চুরে আবার তৈরী করতে হবে।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com